আত্মহত্যা: অবর্ণনীয় যন্ত্রণার অন্তহীন পথ

মোঃ আবুবকর সিদ্দীক

পৃথিবীর সমগ্র প্রাণিকূলের মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের আছে বুদ্ধি-বিবেচনা, ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের বিচারিক ক্ষমতা। স্রষ্টার নিকটে মানুষের আছে দায়বদ্ধতা। পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির প্রতি আছে দায়িত্ব ও কর্তব্য। মানুষের কৃতকর্মের জবাবদিহিতা আছে-দুনিয়া ও আখিরাতে। বিশেষ করে আখিরাতের বিচারক স্বয়ং স্রষ্টা, দাঁড়াতে হবে স্রষ্টার মুখোমুখি। অন্যায়-অপকর্মের জন্য ভোগ করতে হবে ভয়ানক শাস্তি। সৎকাজের জন্য আছে সুসংবাদ।

পৃথিবীতে মানুষের চলার পথটি সর্বদা কুসুমাস্তীর্ণ নয়। মানুষের চলার পথে আছে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না। সুখ বা দুঃখ কোনটাই খুব বেশি স্থায়ী নয়। সুখের পর দুঃখ কিংবা দুঃখের পর সুখের দেখা মেলে। নিকষ অন্ধকার বিদীর্ণ করে যেমন সোনালী সূর্য ওঠে ঠিক তেমনিভাবে বেদনার মেঘ কেটে গিয়ে একসময় অনাবিল আনন্দ ধরা দেয়। শুধু দুঃখ-কষ্টের দিনগুলিতে ধৈর্যসহকারে সুদিনের সাধনা করতে হয়। ধৈর্যচ্যুতি ঘটলেই বিপদ। ধৈর্যের প্রতিদান সুমিষ্টই হয়ে থাকে। পৃথিবীতে সবকিছুই চাঁদের হাসি, সূর্যের আলো, প্রকৃতির বায়ু কিংবা বৃষ্টির পানির মতো বিনা খরচায় জোটে না। বেঁচে থাকার জন্য যুদ্ধ করতে হয়, বিকাশের জন্য সাধনা করতে হয়, সুখের জন্য থাকতে হয় ত্যাগের মানসিকতা। জ্ঞানার্জনের জন্য সাধনা করতে হয়; সম্পদের জন্য করতে হয় পরিশ্রম। উৎকর্ষের জন্য অনুশীলন করতে হয় আর খ্যাতির জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা থাকা চায়। কিছু ব্যতিক্রমও আছে। প্রিভিলেজ অফ বার্থ বা জন্মগত সুবিধা বলে একটি প্রবচন আছে। রাজার সন্তান স্বভাবতই রাজপুত্র বা রাজকন্যা এবং রাজ সিংহাসনের দাবিদার-এটি প্রথাগত। ধনকুবেরের সন্তান উত্তরাধিকারসূত্রে বিত্তবৈভবের মালিক হওয়াটাই স্বাভাবিক। এই উভয়বিধ ক্ষেত্রেও অনেক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত আছে।

কোথায় কার জন্ম, বিত্ত-বৈভব কতটুকু আছে বা নেই-এগুলো নিতান্তই গৌণ বিষয়। ধনদৌলত, অর্থ-কড়ির চেয়ে জ্ঞানের মূল্য বা মাহাত্ম্য অনেক বেশি। জ্ঞানার্জন করতে পারলেই পৃথিবীটাকে জয় করা যায়। দৃঢ় প্রত্যয় ও নিরন্তর সাধনা থাকলে বিত্ত-বৈভব অর্জন করাটা কঠিন কিছু নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক ধনীর দুলালই হয়তবা তেমন কোন পদচিহ্ন রেখে যেতে পারেননি, আবার অনেক ভিখারীর সন্তান মানবমুক্তির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে গেছেন। পৃথিবীর অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছেন বিত্তবান অনেকেই; কিন্তু পৃথিবী স্মরণে রেখেছে অনেক নিঃস্বকে। দারিদ্র্য সিংহাসনের পথেও বাঁধা হতে পারেনি। আপন সাধনা ও কর্মগুণে রাস্তার লোক থেকে হয়েছেন প্রাসাদের মালিক, প্রজা থেকে রাজা বনে গেছেন। এখানেও বিপরীতমূখি দৃষ্টান্তও আছে। অনেকটা চোখের নিমিষেই মানুষ হতে পারে রাজা থেকে প্রজা কিংবা ধনী থেকে নিঃস্ব। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনার ছড়াছড়ি। সুখ নিতান্তই আপেক্ষিক বিষয়। টাকা-কড়ি, বিত্ত-বৈভব, সুন্দর জীবনসঙ্গী থাকলেই যে সুখের দেখা মিলবে এমন নিশ্চয়তা কোথাও নেই। আবার টাকা-কড়িহীন ব্যক্তিটি যে চরম দুঃখী এমন অনুমিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোরও কোন সুযোগ নেই। কে যে কিসে কিংবা কিভাবে সুখ পাবে-এটা বলা মুশকিল। তবে সকল পরিস্থিতিতে যে যতটা সহজে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে তার সুখে থাকার সম্ভাবনা ততটাই বেশি। পরিবার কিংবা সমাজে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও বোঝাপড়া, যৌক্তিক আচরণ, ত্যাগের মানসিকতা ও অন্যের মতামতকে সম্মান করা প্রভৃতি বিষয়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবারে কিংবা সমাজে চলতে গেলে নানা বিষয়েই মাঝে মধ্যে মতানৈক্য হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। মতানৈক্য থেকে কথা কাটাকাটি কিংবা হাতাহাতির ঘটনাও ঘটতে পারে। আবার রোগ-শোক, ব্যাধি, ক্লেশ-এগুলো মানব জীবনেরই অনুষঙ্গ। মানুষের প্রত্যাশা অনুসারে প্রাপ্তিযোগ সর্বদা নাও হতে পারে। সব মানুষই সুবিবেচক নন। সবার কাছ থেকে সবকিছু প্রত্যাশা করাটাও ঠিক নয়। তাছাড়া, জীবনের জন্য অক্সিজেন বা খাদ্যের ন্যায় অন্য কোনকিছুই অপরিহায নয়।কর্ম প্রচেষ্টার প্রাপ্তি সহজাত। দৃঢ় প্রত্যয়, সততা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও অধ্যবসায় থাকলে লক্ষ্যে পৌঁছানো সময়ের ব্যাপার মাত্র। মানুষের মনোজগতে কাউকে নিয়ে বিশেষ ভাবনার উদ্রেক হওয়া কিংবা কারো প্রতি বিশেষ অনুরাগ সৃষ্টি হওয়াটাও অমূলক নয়। তবে এসকল বিষয়ে পরিস্থিতি সর্বদা নিজের অনুকূলে থাকবে এমনটি প্রত্যাশা করা যায়না। কাকে নিয়ে কে স্বপ্নের জাল বুনবে সেটা একান্তই তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণই উত্তম পন্থা। আবেগ-অনুভূতি দমিয়ে রাখা অসাধ্য নয়। মানুষ কীনা পারে। তাছাড়া, কেউই জীবনের জন্য অপরিহায নয়। মানুষ সুন্দরের পূজারী। এ বিষয়ে খুব একটা দ্বিমত না থাকলেও সুন্দরের ধরণ নিয়ে মতভেদ আছে। বাহ্যিক সৌন্দযের চেয়ে অন্তর্নিহিত সৌন্দযই শ্রেয়। কারণ, বাহ্যিক সৌন্দয ক্ষণস্থায়ী। তাছাড়া, বাহ্যিক সৌন্দযে কেউকেই চরম বা পরম মনে করার অবকাশ নেই। এখন যাকে দেখে মনে হলো অপূর্ব কিছুক্ষণ বাদেই অন্য আরেকজনকে দেখে ধারণা পাল্টে যেতে পারে। অবস্থানভেদেও মানুষের চিন্তা-চেতনা বদলে যায়। পিছনের কথা ভেবে আপন মনেই হেসে ওঠে-কতোই না বোকা ছিলাম!

কৃতকর্মের ফল অবশ্যম্ভবী। অপকর্মের অনুশোচনা বা আত্মগ্লানি ভোগ করতেই হবে। রবার্ট ক্লাইভ, মোহাম্মদী বেগ কিংবা আলোকচিত্র শিল্পী কেভিন কার্টারের মতো অনেকেই কৃতকর্মের অনুশোচনা থেকে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিল। এভাবে কি পরিত্রাণ মেলে? স্রষ্টার নিকট কৃতকর্মের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে পাপ মোচনের আশা করা যায়। আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হতে নেই। পৃথিবীতে সবকিছুই একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যে গিয়ে থামে। প্রাণীকূল ও উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। চলতে চলতে গতি মন্থর হয়ে পড়ে; সক্ষমতা ক্ষয় হতে হতে শূণ্যে গিয়ে পৌঁছে। একসময় শ্রীহীন, নিস্তেজ ও নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। এটিই জীবনের ধর্ম। জীব মাত্রই মৃত্যু অনিবার্য। তবে জীবনের শুরু হতে সমাপ্তির ব্যপ্তি কেউই জানে না। কে যে কখন না ফেরার দেশে পাড়ি জমায়!

আত্মহত্যা নিতান্তই কাপুরুষোচিত ও জঘন্যতম কাজ। কোন কারণই আত্মহত্যার জন্য যথেষ্ঠ নয়। জীবন অমূল্য সম্পদ। কোন দুঃখ, কষ্ট, হতাশা, ব্যর্থতা, রাগ, অনুরাগ, অভিমান, আত্মগ্লানি প্রভৃতির বশবর্তী হয়ে আত্মহত্যা করাটা একান্তই বোকামী। আত্মহত্যা কোনভাবেই কোন সমস্যার সমাধান নয়। উপরন্তু, আত্মহত্যা অনেক সমস্যা সৃষ্টি করে। বিশেষ করে আত্মহত্যাকারী নিজেই বেছে নেয় অবর্ণনীয় যন্ত্রনার অন্তহীন পথ। প্রত্যেকটি জীবন সমান মূল্যবান। যদিও মানুষের যোগ্যতা, দক্ষতা ও সামর্থ্যের নিরিখে সামাজিক অবস্থানে কিছুটা তারতম্য করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে আত্মহত্যার নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নেই। তবে মোটাদাগে যে ধারণা পাওয়া যায় সেটিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ১৩/১৪ হাজারের কাছাকাছি। এই সংখ্যাটি নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক।

আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে যে শুধু একজন মানুষ তার অমূল্য জীবনটাকে শেষ করে দেয় বিষয়টি এতোটা সরলভাবে দেখার সুযোগ নেই। আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে প্রথমত মানুষ সৃষ্টির তাৎপর্য ও মাহত্ম্যকেই চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে ভুলুন্ঠিত করা হয়। এর ফলে স্বভাবতই স্রষ্টা ভীষণ কষ্ট পান। দ্বিতীয়ত, পরিবার, সমাজ কিংবা দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা অস্বীকার করা হয়। তৃতীয়ত, মানব প্রকৃতি ও মনুষত্বকে হেয় করা হয়। চতুর্থত, সংশ্লিষ্ট পরিবার কিংবা পরিবারগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পঞ্চমত, আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণ চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পতিত হয়। ষষ্ঠত, বিশেষ করে নারীদের আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে তার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জীবন ও বেড়ে ওঠা নিয়ে সংকট তৈরি হয়। সপ্তমত, পরিবারের সদস্যদের মনে চরম নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। অষ্টমত, অনেকক্ষেত্রে পারিবারিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে আইনগত প্রক্রিয়ায় আটকে পড়ার আশঙ্কা থাকে। নবমত, আপনজন বা প্রিয় মানুষটিকে হারিয়ে বিষন্নতা বা জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে। দশমত, পারিবারিক কলহে আত্মহত্যা সংঘটিত হলে তখন অপর ব্যক্তিটিও চরম অপরাধবোধে ভূগতে থাকে এবং তার প্রতি পারিবারিক চাপ তৈরি হয়। এরূপ অপরাধবোধ ও মানসিক চাপ থেকে আরেকটি আত্মহত্যাও সংঘটিত হতে পারে; পরিবারে চরম অশান্তি বিরাজ করে। আত্মহননের আরেকটি ভয়ানক দিক হলো আত্মহত্যা অন্যান্য মানুষের মধ্যেও এই প্রবণতা সঞ্চারিত করে। নামী-দামী কিংবা সেলিব্রেটিগণ আত্মহত্যা করলে এই প্রবণতা সঞ্চারিত হওয়ার মাত্রাটা আরো বেড়ে যায়।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ করে ইসলামী শরিয়তে আত্মহত্যা মহাপাপ। মহান আল্লাহ পাক আত্মহত্যা থেকে বিরত থাকতে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন এবং আত্মহত্যার কঠোর পরিণতি সম্পর্কে পবিত্র কোরআন শরীফে কতিপয় আয়াত নাজিল করেছেন। মহান আল্লাহ পাক পবিত্র আল কুরআনে সুরা নিসার ২৯ ও ৩০ নম্বর আয়াতে বলেছেন, ‘তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করোনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু এবং যে সীমা লঙ্ঘন করে অন্যায়ভাবে তা(আত্মহত্যা) করবে, তাকে আমি অগ্নিতে দগ্ধ করব, এটা আমার পক্ষে সহজ।’ এছাড়া, সুরাতুল বাকারাহ ১৯৫ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ পাক বলেন, ‘আর তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করোনা’। এ দু’টি আয়াতের বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়, আত্মহত্যা কতোটা জঘণ্য ও নিন্দনীয় কাজ। আত্মহত্যা সরাসরি সীমা লঙ্ঘন। আর সীমা লঙ্ঘনের শাস্তি জাহান্নামের আগুন ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ পাক আত্মহত্যাকারীর জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন।

মহানবী হয়রত মুহাম্মদ (স.) আত্মহত্যার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত ছাবিত বিন যিহাক (রা.) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন কিছু দিয়ে নিজেকে হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন তাকে সে বস্তু দিয়েই শাস্তি প্রদান করা হবে।’(সহীহ বুখারি: ৫৭০০ , মুসলিম: ১১০) অন্য একটি হাদিসে রাসুল (স.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে পাহাড় থেকে পড়ার অনুরূপ শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। যে বিষপানে আত্মহত্যা করবে সে স্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে বিষপানের আযাব ভোগ করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কোন ধারালো অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করবে, সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে তা দ্বারা শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।’(বুখারি:৫৭৭৮) ইসলাম ধর্মের মতো অন্যান্য ধর্মেও আত্মহত্যাকে মহাপাপ হিসেবেই বর্ণিত হয়েছে। সনাতন ধর্মের ঈশ উপনিষদে আত্মহত্যার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। এতে সাবধান করে বলা হয়েছে যে, আত্মহত্যাকরী মৃত্যুর পর আনন্দহীন লোকে গমন করবে। অন্যান্য ধর্মের বিধানও একইরূপ।

আত্মহত্যা প্রতিরোধ কিংবা থামানোর একক কোন মন্ত্র বা পথ বাতলে দেওয়া দূরুহ। সেক্ষেত্রে কতিপয় বিষয় নিয়ে এগোতে হবে।তবে প্রধানতম নিয়ামক হতে পারে জীবনবোধ সম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে ধর্মীয় জ্ঞানকে অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে নিতে হবে। মানব জীবনের মূল্য ও প্রকৃতি, স্রষ্টা ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা, ন্যায়-অন্যায় এবং পরকালের ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ আত্মহত্যার পথে পা বাড়ানোর আশঙ্কা অনেক কম। এছাড়া পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ভূমিকাও আত্মহত্যা প্রবনতার রশি টেনে ধরতে পারে। আত্মহত্যা প্রতিবাদের কোন ভাষা কিংবা প্রতিশোধের কোন পথ হতে পারেনা। এটি দুঃখ, কষ্ট বা যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণের কোন পন্থা নয়। বরঞ্চ আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে সামান্য থেকে কঠিন কিংবা কঠিন থেকে কঠিনতর কোন যন্ত্রণায় নিপতিত হতে হয়।

জীবনটা অনেক মূল্যবান। সকল প্রতিকূলতাকে জয় করে সামনে এগিয়ে চলায় মানব জীবনের ধর্ম। কষ্ট যতোই তীব্র হোক, সমস্যা যতোই ঘনীভূত হোক, বিপদ যতোই প্রকট হোক-কোন পরিস্থিতিতেই আত্মহত্যা নয়। জীবনযুদ্ধে কোথাও ব্যর্থ হয়ে থেমে যাওয়ার কোন অবকাশ নেই। শত ব্যর্থতায়ও মনোবল অটুট রাখতে হবে। ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করে তা কাটিয়ে উঠতে হবে। তাহলে একসময় জয় কিংবা ভালো বিকল্প ধরা দেবেই। আত্মহত্যার পরিণতি ভয়াবহ। কোন অবস্থাতেই আত্মহত্যার মতো এরূপ ভয়াবহ পরিণতিকে আলিঙ্গণ করা কোন বিবেকবান মানুষেরই কাজ হতে পারে না।

#

লেখক: জনসংযোগ কর্মকর্তা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

পিআইডি ফিচার